Southeast University Journal of Arts and Social Sciences, Vol. 3, Issue 1, June 2020

Climate Change from the Perspective of Bangladeshi Novels

Hamida Begum

জলবায়ুর পরিবর্তন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের উপন্যাস

হামিদা বেগম[১]

Abstract:

Physiography consists of environment and nature. And this physiography is affected by its climate. It is known to us that the climate is controlled by geographical location and natural circumstance of a country. There are so many terms, which are associated with the climate of Bangladesh, such as air pressure, humidity, temperate, etc., and the environment and social system of the country have been developed based on these. But the serious threat of environmental disasters posed by climate change around the world involves human communities and human livelihoods. Not only the natural calamities are liable for climate change but also the anthropogenic influences are responsible. The disasters on the environment and livelihoods caused by climate change have been widely reflected in the literature. In particular, if human love for environment and nature cannot be maintained, the end of the eternal relationship between the earth and human is inevitable. The novels of Bangladesh illustrate this fact in an aesthetic manner. The main focus of these novels is the social changes that take place as a result of climate change. In this article, five notable novels of Bangladeshi literature namely Lalsalu (1948), Kashbaner Kanya (1954), Alam Nagarer Upokatha (1955), Surja-Dighal Bari (1955), Jalochcchash (1972) are analyzed to show how the climate change has impacted the aspects like break ups in human relationship, struggle for existence, displacement and migration, uncertainity in human life, social maladies etc. This article illustrates that these novels are an artistic representation of the human and natural disasters caused by climate change.

Keywords: Literature of Bangladesh, Bangladeshi novels, climate change, environment and disasters, relationship between nature and human

সারসংক্ষেপ:

পরিবেশ প্রতিবেশ নিয়েই আমাদের ভূ-প্রকৃতি। আর এই ভূ-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে তার জলবায়ু। আমরা জানি একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সেদেশের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের জলবায়ুর যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা: তাপ, বায়ুচাপ, আর্দ্রতা, নাতিশীতোষ্ণতা এসবের আলোকে এদেশের পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের যে মারাত্মক আশঙ্কা দেখা দিয়েছে,তাতে মানব সম্প্রদায় ও মানব জীবিকার বিষয়টিও সম্পৃক্ত রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য কেবলই প্রাকৃতিক কারণ: ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, উষ্ণতা বৃদ্ধি,দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহামারী ইত্যাদি দায়ী নয়। মানুষের

[১] চেয়ারম্যান, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
Email: hbegum06@gmail.com

কারণে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহও দায়ী। যাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্ট (Anthropogenic) জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর এই পরিবর্তনে প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের জীবন-জীবিকার উপর যে বড় ধরনের আঘাত বা বিপর্যয় তার চিত্র সাহিত্যেও পড়েছে ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা রক্ষা করা না গেলে মাটি ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের ধ্বংস যে অবধারিত, তারই শিল্পিত চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশের বেশ কিছু উপন্যাসে। মূলত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক যে পরিবর্তন সাধিত হয় সেই বিষয়টিই উপন্যাসগুলোতে প্রধান হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ৪ জন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকের ৫ টি জনপ্রিয় উপন্যাসের : *লালসালু* (১৯৪৮), *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪), *আলম নগরের উপকথা* (১৯৫৫) , *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) ও *জলোচ্ছ্বাস* (১৯৭২)– আলোকে জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রকৃতির একেক জায়গায় একেক রকম পরিবর্তন, মানুষের জীবনযাত্রার ছন্দপতন, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, স্থান বদল, পেশা বদল, মানবিক সম্পর্কের টানা-পোড়েন, সমাজে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি ইত্যাদি চিত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে শিল্পতাত্ত্বিক বর্ণনার নিরিখে। বলা যায় প্রবন্ধটি জলবায়ুর পরিবর্তনে এ দেশের জনজীবন কী ধরনের মানবিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়–তারই শিল্পিত উপস্থাপনা।

পরিবেশ প্রতিবেশ নিয়ে আমাদের ভূ-প্রকৃতি। আর এই ভূ-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে তার জলবায়ু।আমরা জানি, একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সে দেশের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের জলবায়ুর যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে (যেমন: উষ্ণতা,বায়ুচাপ,আর্দ্রতা, নাতিশীতোষ্ণতা) তার আলোকেই এ দেশের পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয়। জলবায়ুর পরিবর্তন যতোই চরমরূপ লাভ করছে ততোই তার প্রভাবে মহামারি, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, রোগ-ব্যাধি, মানসিক-শারীরিক অপুষ্টিসহ মানবিক বিপর্যয়, সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন ও মৃত্যুর হারও বাড়ছে। ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের যে মারাত্মক আশঙ্কা দেখা দিয়েছে,তাতে জলবায়ুর সাথে মানব সম্প্রদায় ও মানব জীবিকার বিষয়টিও সংযুক্ত হয়ে পড়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।[১] জলবায়ুর প্রভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণ: ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, উষ্ণতা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহামারি ইত্যাদি উপাদানই দায়ী নয়। মানুষের কারণে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহও সমভাবে দায়ী। যাকে বলা হয় মনুষ্যসৃষ্ট (Anthropogenic) জলবায়ু পরিবর্তন। সাধারণত কোনো দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চারটি মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয়:

১. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?

২. কোথায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি হচ্ছে?

৩. সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা কোথায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

৪. ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ক্ষতি মোকাবেলায় বা অভিযোজনের জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

বাংলাদেশ একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত।[২] জলবায়ু পরিবর্তনে প্রকৃতি, মানুষ, পরিবেশ, মানুষের জীবিকার উপর যে বড়ো ধরণের আঘাত বা বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয় তার চিত্র সাহিত্যেও পড়েছে ব্যাপকভাবে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক যে পরিবর্তন সাধিত হয় সেই বিষয়টিই মূলত সাহিত্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা রক্ষা করা না গেলে মাটি ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের ধ্বংসও যে অবধারিত তারই শিল্পিত চিত্র উঠে এসেছে সাহিত্যে। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সর্বপ্রথম প্রকৃতি ও মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের কথা বলেছেন। তাঁর বিশাল সাহিত্য জগৎ ও দীর্ঘ জীবনপ্রবাহে তিনি প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিনির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

তবে আলোচ্য প্রবন্ধে যেটি প্রধান বিষয় তা হল: জলবায়ুর ভয়াবহ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের নিম্নবর্গের সমাজে সামাজিক-মানবিক বিপর্যয়, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার বিভিন্ন উপাদানও মানুষের

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে যে প্রভাব ফেলেছে তা শিল্পিত ভাষ্যে তুলে ধরা। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপন্যাসে জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রকৃতির বিপর্যয়ে সামাজিক যে বিশাল পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে তার চিত্র ধরা পড়েছে। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা, মহামারি, স্থানান্তর, পেশার বদল,সামাজিক দুর্নীতি, মানসিক অসুস্থতা, বেঁচে থাকার সংগ্রাম ইত্যাদি নানা বিষয়, যা মানব অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ– তার বিবরণ যেমন আছে, তেমনি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটা মহাপরিণতিও চিহ্নিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের চার জন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকের পাঁচটি উপন্যাস অবলম্বনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে: জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট পরিবেশের ভয়ঙ্কও পরিবর্তন ও তার প্রভাবে সৃষ্ট দুইটি মহাবিপর্যয়: ১.দুর্ভিক্ষগ্রস্ততা ও ২.জলোচ্ছ্বাসের ফলে মানবিক বিপর্যয়ের চিত্রবর্ণন, বিশ্লেষণ। আলোচ্য উপন্যাসগুলো হলো:

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১*): লালসালু* (১৯৪৮)

২. শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭): *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪) ও *আলম নগরের উপকথা* (১৯৫৫)

৩.আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩*): সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫)

৪. সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-): *জলোচ্ছ্বাস* (১৯৭২)

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে দুর্ভিক্ষ অন্যতম। সমাজবিজ্ঞানী ম্যালথাস তাঁর *ফাষ্ট এসে অন পপুলেশন (প্রথম প্রকাশ ১৭৬৮)* গ্রন্থে সমাজ-জীবনে দুর্ভিক্ষের ভূমিকা অপরিসীম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এটি প্রকৃতির সর্বশেষ এবং সবচাইতে ভয়াবহ দান।[৩] দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে মাটি শুকিয়ে উর্বরতা হারানো অঞ্চলে মন্বন্তর-দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটে, যা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে সঙ্কট-বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এর প্রভাব মানব সমাজে তীব্র অন্নহীনতার ও সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। নিম্নবিত্ত গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে বেঁচে থাকার যে কঠিন সংগ্রাম তা বিপন্ন মানবতাকে নির্দেশ করে। বাংলা সাহিত্যে যারা দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,তারাশঙ্কও বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার প্রমুখ। দুর্ভিক্ষ নিয়ে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতন সংক্রান্ত মনোবৃত্তি সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে ।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও অন্যান্য মানবিক কারণে দুর্ভিক্ষের প্রভাব সুদূর প্রসারী। বিশেষ করে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ কয়েক শতাব্দী থেকেই দুর্ভিক্ষ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পূর্বে খ্রিষ্টাব্দ ৯৪২–১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৪৫টি দুর্ভিক্ষ হয়। এরমধ্যে ১৭৭০, ১৮৬৫ এবং ১৮৭৩-সালের দুর্ভিক্ষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।এই দুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ(প্রায় তেত্রিশ লক্ষ) এবং ১৮৮৬ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর বাংলার সমাজ জীবনে রেখাপাত করে গভীরভাবে।[৪] তবে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাতএই দুর্ভিক্ষ ছিল সবচাইতে ভয়াবহ। তারপর সদ্য স্বাধীন দেশে উপনিবেশ-উত্তর আধুনিক যুগের প্রথম দুর্ভিক্ষ হয় ১৯৭৪ সালে। প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন তাঁর *পভার্টি অ্যান্ড ফেমিনস:এন এসেই অন ইনটাইটেলমেন্ট অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন* (১৯৮১) গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে: 'ফেমিন ইন বাংলাদেশ' এ প্রথমত উপর্যুপরি বন্যাকে ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী বলেছেন।[৫] সারা দেশে তীব্র বন্যায় ফসলহানিতে সরকারের তখন 'দুর্ভিক্ষ' ঘোষণা দেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। প্রায় ছয় হাজারের মতো লঙ্গরখানা খোলা না হলে আরো মৃত্যুর আশঙ্কা ছিলো।আন্তর্জাতিক মার্কিন ষড়যন্ত্রে খাদ্যশষ্যের মজুদের সরকারি ক্ষমতা কমে গিয়ে এ দুর্ভিক্ষকে ত্বরান্বিত করেছিলো।[৬] এই সব দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অধিকাংশ গ্রামের নিম্নবিত্ত কৃষক, জেলে, তাঁতী, কামার, কুমার, মজুর প্রভৃতি। বাংলাদেশের উপন্যাসে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত

কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে এই সব নিম্নবর্গের মানুষের বিপর্যয়ের চিত্র উঠে এসেছে। বাংলাদেশের উপন্যাসে দুইভাবে পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এই উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে:

১. উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের স্মৃতিচারণায়

২. প্রত্যক্ষ বিবরণে

প্রথমেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*[৭] উপন্যাস, এখানে উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে 'শষ্যহীন ও জনবহুল অঞ্চলের কথা'। যে অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন সেখানে ঘরে ঘরে খাবারের হাহাকার।–

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারীতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন।[৮]

'দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার' অস্তিত্বের অন্বেষণে মহব্বত নগর গ্রামে *লালসালু* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদের আগমন। শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার জাল বিস্তার করে মিথ্যা বিশ্বাসের উপর ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ী মজিদ গড়ে তোলে তার সাম্রাজ্য। গ্রামের নিম্নবর্গ,দুঃস্থ-দরিদ্র কৃষিজীবি মানুষের হাহাকারকে পুঁজি করে মজিদ নিজে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায় পরিবেশ বিপর্যয়। উপন্যাসের ভাষায়: 'ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ জমির ফসল'। উপন্যাসের বর্ণনায় রয়েছে হাহাকারের ধ্বনি:সব তো গেল। এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা খাওয়ামু কী?[৯]

এখানে পরিস্কার বোঝা যায়, সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর; জমির ফলনের উপর নির্ভর বাংলার কৃষিজীবি মানুষেরা। তাই জলবায়ুর পরিবর্তনে অতি বা অনাবৃষ্টিতে তারা মারাত্বক খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়। শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের গ্রামের ক্ষুদ্র চাষীদের অনিশ্চয়তা পূর্ণ জীবনের চিত্র *লালসালু* উপন্যাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র ও লোকায়ত অসহায় মানুষের ধর্মভীতি-মাজারভীতিকে পুঁজি করে সামাজিক শাসন-শোষণের অন্যান্য কার্যকরণের পাশাপাশি সমান দক্ষতায় উপস্থাপিত হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়ে মানবতার হুমকির চিত্র।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) *কাশবনের কন্যা*[১০]ও *আলম নগরের উপকথা*[১১] উপন্যাসদ্বয়ে রয়েছে দুর্ভিক্ষের নির্মম চিত্র। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদী নির্ভর চরাঞ্চলের গ্রামীণ জীবন উপন্যাসদ্বয়ের মূল বিষয়। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়তির সাথে এই চরাঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে দেখা যায় বঙ্গোপসাগর নিকটবর্তী চরাঞ্চলের মানুষের সমুদ্রের মতই জোয়ার ভাটার সংগ্রামী জীবন–"এই দেশে–এইখানে লড়াই করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে মানুষ। বিরূপ প্রকৃতি, বিরূপ নদী, লোভী– মানুষ।"[১২]

উপন্যাসের চরিত্র হোসেন ও শিকদারের জীবনকাহিনির আড়ালে দেখা যায় দুর্ভিক্ষ কীভাবে মানুষকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ঠেলে দেয় নিষ্ঠুর অমানবিক সংগ্রামে। এতিম হোসেন সারারাত ব্যস্ত থাকে 'দুই মুঠো ভাত জোগানোর চিন্তায়।' আবার পরিবারের সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করতে হয় 'দুই মুঠা ভাত'। জমির অভাবে কৃষিকাজ ছেড়ে বেছে নিতে হয় কেরায়া বা নদী পারাপারের কাজ। এই পেশা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় সে বেছে নেয় এক রূঢ় জীবন। বেঁচে থাকার নিশ্চয়তায় নিজের গ্রাম ত্যাগ করে যাত্রা করে ভাটির দেশে। প্রকৃতির বিরূপতাই শিকদারকে গ্রাম ছেড়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভাঁটি অঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থায় মানুষকে পেশা বদল করে যে কোন অমানবিক রুদ্র অথবা নিষ্ঠুর পেশা অবলম্বন করতে হয়। এমন কী উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি দুর্ভিক্ষের করাল থাবা হোসেন বা শিকদারের জীবন থেকে কেড়ে নেয় তাদের প্রিয় নারী সাকিনা বা জোবেদাকে। অর্থহীনতা ও অন্নহীনতা তাদের মানবিক সম্পর্কে চিরসংঘাত তৈরি করে অসহায় মৃতুবৎ বানিয়ে দেয়। *আলম নগরের উপকথা* উপন্যাসে 'ক্ষীরসায়র' বা 'আলম নগরের' প্রতীকে চিহ্নিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামের অধিবাসীদের জীবনে যে সব প্রাকৃতিক দূর্যোগ বারবার আঘাত হেনে

জীবনকে বিপন্ন করে দেয় তারই চিত্র :'বন্যা, অজন্মা, মহামারি ও মন্বন্তরের কালো কালো ঢেউ আসিয়া জীবনযাত্রা ক্রমান্বয়ে পর্যুদস্ত করে দেয়।'[১৩] উপন্যাস পাঠে আরও জানা যায়–

চাষী রৌদ্রে পুড়িয়া চাষ করিতেছে, অস্থি-কংকালসার গৃহস্থবধু পুকুরের কলমি শাক তুলিতেছে, রুগ্ন শিশুগুলো মাছ ধরিতেছে–ধুলা কাদা মাখিয়া, কলা গাছ চিরিয়া তাহার 'থোড়' খাইতেছে; বৃদ্ধেরা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।[১৪]

এভাবে ক্ষুদ্র কৃষক মফেজের দুর্গত চিত্রে অঙ্কিত হয় দুর্ভিক্ষ তাড়িত মানুষের চিত্র'উপবাসতো লেগেই আছে, এমন অবস্থা কী একলার আমার হুজুর, এদেশের জনে জনে।'[১৫] উপবাসী মফেজ যেন দুর্ভিক্ষতাড়িতএদেশের অসংখ্য নিম্নবর্গের প্রতিনিধি ।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবু ইসহাক(১৯২৬-২০০৩) রচিত *সূর্য-দীঘল বাড়ি* (১৯৫৫)[১৬] দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। দুর্ভিক্ষ পূর্ব ও দুর্ভিক্ষ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ামূলক উপন্যাস এটি। একটি ভূমিহীন নিম্নবর্গের পরিবারের জীবন-সংগ্রাম উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলেও এর কাহিনির সূত্রপাত দুর্ভিক্ষের বিবরণে। উপন্যাস পাঠে দেখা যায়, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তরের' দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে নিঃস্ব-নিস্নবিত্ত-অবলা-অসহায় স্বামী পরিত্যক্ত নারী'জয়গুন'। গ্রামে অবস্থানকালে জয়গুনের উপর দিয়ে সামাজিক বিরূপতার যে ঝড় বয়ে যায় তা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের স্বজনহীন নিঃস্ব নারীরই প্রতিকী চরিত্র, যারা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত মানবিক বিপর্যয়ের মাঠে। স্বামী-পরিত্যক্ত জয়গুন দুর্ভিক্ষ এড়িয়ে পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে বাস করতে গেলে প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হয় দুই সন্তানসহ। শেষে ফিরেও যায় শহরে। প্রথম স্বামী জব্বর মুনশীর মৃত্যুর পর অনেকটা জোর করে দখল নেয় তার বসতভূমি, মৃত জব্বর মুনশীর দুই ভাই। এরপর দ্বিতীয় স্বামী করিম বক্সের কাছ থেকে পাওয়া 'ঘর' জয়গুন বিক্রি করে দেয় দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে। তারপর খাদ্যেও আশায় চরমভাবে নিঃস্ব জয়গুন দুর্ভিক্ষপীড়িত শহরমুখী মানুষের মিছিলে শামিল হয়। কিন্তু শহরেও যে তাদের মতো নিঃস্ব মানুষের বেঁচে থাকার পথ রুদ্ধ তা বুঝতে পেরে শহরমুখী গ্রামের অসহায় মানুষের মিছিলের সাথে আবার গ্রামের নারকীয় জীবনে পুনঃপ্রবেশ করে জয়গুন। গ্রামে ফিরে আসা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের চিত্র এভাবে চিত্রায়িত উপন্যাসে:তাদের শির-দাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ-শুষ্ক ও বিবর্ণ।[১৭]

সেই মুহূর্ত থেকে সে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে থাকে চরম দারিদ্রতার পাশাপাশি নানা সামাজিক প্রতিকূলতার। জীবিকার তাগিদে জয়গুন যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে,তখনই সে অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন-রক্ষণশীল গ্রাম-সমাজকে অস্বীকার করেছে। তার স্বাধীনসত্তাকে মেনে নিতে পারে না গ্রামের প্রভাবশালী গদু প্রধানসহ মসজিদের ইমামও। ধর্মের দোহাই দিয়ে রক্ষণশীল সমাজ তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে, সেই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তার প্রকাশে ছিল নিদারুণ ক্ষোভ: "তৌবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই।"[১৮] কারণ দুই সন্তানসহ পুরো পরিবারের খাদ্য যোগানোর দায়িত্বে সে একাই নিরন্তর যোদ্ধা। সমাজের ভূমিহীন একটি দুর্ভিক্ষ কবলিত পরিবারের জীবন সংগ্রামের কাহিনিতে মূল চরিত্র জয়গুনের ভিতর-বাহির দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়: দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া, সামাজিক দূর্নীতি, স্থান বদল, খাদ্যের অন্বেষা, প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাতের পাশাপাশি সামাজিক শোষণে প্রায় মুমূর্ষু জীবনের ছবি। প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাত– 'দুর্ভিক্ষ' বা 'মন্বন্তর' এর প্রভাবে যে সমাজ ভয়ঙ্কর, জটিল, বৈরি,আগ্রাসী রূপ ধারণ করে তারই উৎকৃষ্ট দলিল *সূর্য দীঘল বাড়ি* উপন্যাস।

উপন্যাসটিতে অত্যন্ত বাস্তবোচিত ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে জলবায়ুর বিধ্বংসী প্রভাবে দুর্ভিক্ষ তাড়িত এক গ্রামে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে ধীরে ধীরে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এক নারীর ভয়াবহ এক সংগ্রামী জীবনের ছবি–

তখন দুর্ভিক্ষ সবে দেখা দিয়েছে, দূর্ণামের ভয়ে স্বামী-পরিত্যাক্তা জয়গুন এখনও ঘরের বার হয়নি। খেতে না পাওয়ায় তার বুকে দুধ ছিল না। দুধের শিশু দুধ না পেয়ে শুকনো পাট খড়ির মত হয়েছিল। শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন মারা গেল, তাকে কবর দিতে কাফনের কাপড় জোটেনি এই অবস্থায়

পরনের শাড়িটার অর্ধেক দিয়ে কাফন পড়িয়ে তাকে যখন কবরে নামানো হয় তখন জয়গুন বিলাপ করতে করতে বলেছিল-'আইজ তোরে বউ সাজাইয়া দিলাম'।[১৯]

সূর্য-দীঘল বাড়ীর অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায় ক্ষুধাতুর জীবনের ছবি। জলবায়ুর তীব্রতর পরিবর্তনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আক্রমন কীভাবে খাদ্য সংকট, স্বজন সংকট, অধিকার সংকট, জীবন সংকটের সৃষ্টি করে ও শোষক, নিপীড়ক, কুসংস্কারপন্থীদের উত্থান ঘটিয়ে সেই সঙ্গে দুর্বল অসহায়দের কীভাবে অবদমনের শিকারে পরিণত করে তারই এক বাস্তব উপস্থাপনা এই উপন্যাস। প্রকৃতির বিরূপ প্রতিকূলতা বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে এভাবে যুগ যুগ ধরে নারকীয় বাসে পরিণত করেছিল।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সর্বশেষ উপন্যাস বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নারী লেখিকা সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭-) উপন্যাস *জলোচ্ছ্বাস*।[২০] *জলোচ্ছ্বাস* সেলিনা হোসেনের দ্বিতীয় উপন্যাস। উপন্যাসটিতে জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস-টর্নেডো-ঝড়-ঘূর্ণিব্যাতার সাথে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবন ও জনপদের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন-সংগ্রামের আবহমান সত্য চিত্রিত হয়েছে নান্দনিক ব্যঞ্জনায়। এই উপন্যাসে ব্যাপকভাবে এসেছে জলবায়ুর ধ্বংসাত্বক প্রভাবে জনজীবনে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি।

বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চল ও দূরবর্তী সমুদ্রদ্বীপ সন্নিহিত মানুষের যাপিত জীবন ও অস্তিত্বের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত এটি। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর যে মহা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণি জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ বাংলা বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছিল তাকে উপজীব্য করে এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে লেখিকার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় দেশের দক্ষিণাঞ্চল। গিয়েছিলাম সেসব এলাকায়। একটি চর দেখিয়ে মাঝি বলল, এখানে বসতি ছিল। এখন বিরান। একটি গাছও নেই। মৃত্যু, লাশ, বেঁচে থাকাদের আহাজারি, সন্তান হারানোর কান্না, বিধ্বস্ত জনপদ দেখে বিমূঢ় হয়ে যাই। ত্রাণ বিতরণকে একটি কঠিন কাজ মনে হয়েছিল সেদিন।... জীবন-মৃত্যুর লড়াই করে মানুষের বেঁচে থাকা দেখে জীবনের কাছে নতি স্বীকার না করে পারিনি। সেদিন মনে হয়েছিল সাগরপাড়ের মানুষের জীবনতৃষ্ণা অনেক প্রবল। যখন পত্রিকায় দেখেছিলাম যে পনেরো দিনের মাথায় ওরা আবার জাল গুছিয়ে মাছ ধরতে সাগরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এইসব মানুষের কথাই এই উপন্যাসের পটভূমি।[২১]

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ বাংলার বঙ্গোপসাগর-উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রতিকূল প্রকৃতি ও সামাজিক অপশক্তির বিরদ্ধে সংগ্রামশীল মানুষের বহমান জীবনধারা *জলোচ্ছ্বাস* উপন্যাস। বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষা পটুয়াখালী জেলার আগুনমুখা নদীর তীরবর্তী চর রাঙাবালী এই উপন্যাসে ঘটনার স্থান। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মেঘনা, তেঁতুলিয়া, আগুনমুখা, রাবনাবাদ, বুড়োগৌরাঙ্গ, কাজল নদীর কূলে কূলে আর বঙ্গোপসাগরের দুর্ধর্ষ ছায়ায় স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধে, ফসল ফলায় আর জীবন নির্মাণ করে। দারিদ্র্যের কঠিন আলিঙ্গনে ওরা বিধ্বস্ত দুর্যোগের কালরাত চারদিকে অমানিশার অন্ধকার ঘনিয়ে তোলে। তবুও হৃদয়ের দৈন্য ওদেরকে আশাবাদী জীবনের সঙ্গীত হতে বিচ্যুত করেনি। ওরা ঘা খেয়ে খেয়ে বয়স্ক হয়। অভিজ্ঞতার জারকরসে নিষিক্ত হয়ে আপন পৃথিবী গড়ে তোলে।[২২] এ রকম একটি স্বাভাবিক জনপদকে প্রকৃতির আক্রোশ কীভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে এই উপন্যাসে রয়েছে তারই অনুপুঙ্খ বর্ণনা। জলবায়ুর বৈচিত্রময় প্রভাবে দক্ষিণ বাংলার এই অঞ্চলটি সুপ্রাচীনকাল হতে ভাঙন আর নির্মানের মধ্যদিয়ে দীপ্যমান। এই উপন্যাসেঔপন্যাসিক বস্তুনিষ্ঠ জীবনাবেগে ফুটিয়ে তুলেছেন দক্ষিণ বাংলার উপকূলবর্তী এই জনপদের দুটি রূপ : একদিকে শ্রেণীশোষণ, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা, অন্যদিকে বিরূপ প্রকৃতির প্রতিকূল উপস্থিতি।[২৩] হিংস্র প্রকৃতি, সাগরের উষ্ণতা ও মানুষে মানুষে অসাম্য ও বিভেদ— এসবের সাথে প্রতিনিয়ত যাদের লড়াই, ধ্বংসস্তুপ থেকে পুনরায় বেরিয়ে এসে যোদ্ধার বেশ ধারণ—এই-ই যাদের জীবনের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি সেই আদিম, ভয়ঙ্কর ও অরক্ষিত জনপদের চিত্রায়ণ রয়েছে *জলোচ্ছ্বাস* উপন্যাসে।

মনে হয় না এ গাঁ ওরা কোনোদিন চিনতো। একটা সাজানো ছবিকে কে যেন ওলোটপালোট করে দিয়ে গেছে। কোন কোন ভিটি এমনভাবে ধুয়ে গেছে যে, মনে হয় না কেউ এখানে ঘর তুলে কোনোদিন বাস করেছিল। করম আলী ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে থাকে। শক্ত হওয়ার মানসিকতা অর্জন করে। জলোচ্ছ্বাস যখন জীবনকে ছিনিয়ে নেয়নি তখন আর মৃত্যুর চিন্তা নয়। এবার বাঁচার পালা। বাঁচতে হবে।[২৪]

প্রকৃতির উন্মত্ত পরিবর্তনে যে জলোচ্ছ্বাসের আক্রমণ তারশেষে দেখা যায়, মাইলের পর মাইল শূন্য বিরান মরভূমিতে পরিণত, অর্ধমৃত মানুষগুলোর উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা,চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য লাশের মাঝে যার যার প্রিয়জনদের উন্মাদের মতো খোঁজে ফেরা,এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের পর আবার স্বভাবিক জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা-এভাবে জীবনের চলমানতাকে অব্যাহত রেখে উপন্যাসের সমাপ্তি।বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এভাবেই চিহ্নিত হয়েছে শৈল্পিকতার নিরিখে।

মোট ১৩টি পর্বে রচিত *জলোচ্ছাসের* শেষের তিনটি পর্বে বর্ণিত হয়েছে রাঙাবালী চরে তীব্র ঘূর্ণি জলোচ্ছ্বাসের আগমন, আক্রমণ ও পুরো জনপদ বিলোপ করে দেওয়া। একটি নির্দিষ্ট দিনে-সাতাশে কার্তিক, শুরু করে শেষ পর্যন্ত ঘণ্টা-সেকেন্ডের হিসাবে রাঙাবালী চরের প্রতিটি ঘরে জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা, সন্দেহ, আগাম আভাস ইত্যাদি এবং শেষ পর্যন্ত স্মরণাতীতকালের ভয়াবহতম জলোচ্ছ্বাসের মরণ ছোবলে জীবন্ত জনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ার খবরসময়ের হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে।মাত্র ২-৩ ঘণ্টাব্যাপী সংঘটিত অকল্পনীয় ঝড়াঘাতের যে বর্ণনা উপন্যাসে রয়েছে, ভাষার কারুকার্যময়তায় রাঙাবালী চরের বিপর্যস্ত মানুষরা জীবন্ত হয়ে ওঠে। আবার একেবারে শেষ পর্ব- ১৩ তে বিধ্বস্ত, বিবর্ণ, প্রাণশূন্য জনপদে রিলিফ টিমের আগমনে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও সামাজিক অপশক্তিকে পুনরায় সক্রিয় হতে দেখা যায় :

১. আমার জমির দরকার আমি জমি নিচ্ছি। তোমার মত পচা লাশ টাইনা গোর দেওয়ার মত সুময় আমার নাই। (করম আলীর প্রতি আফজাল পাটোয়ারী)[২৫]

২. রিলিফের অনেক জিনিস আলতাফ চেয়ারম্যানের গুদামে উঠেছে। খবরটার রোষ ভেতরে ভেতরে ওদের সবাইকে ধূমায়িত করেছে। ... বসে বসে শোক করার লোক ওরা নয়।[২৬]

জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসে রয়েছে উপকূলের অনিশ্চিত ও সংগ্রামমুখর জীবনে প্রতিকূল প্রকৃতির হিংস্র ও ভয়ঙ্কর আক্রোশের চিত্র-এটি জলবায়ুরইবিধ্বংসী প্রভাব। তাছাড়া অসংখ্য মৃত্যু, লাশ, দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের মধ্যেও মানুষের জীবনসংগ্রাম থাকে অব্যাহত। প্রকৃতির হিংস্র ছোবলে কিছু সময়ের জন্য হলেও শ্রেণীবৈষম্য ভুলে দুর্গত মানুষগুলো একাকার হয়ে যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসহায় মানবতার ঐক্যবদ্ধতা উপন্যাসের অন্যতম আলোমুখ।

জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র করম আলী। ভাঙন ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে চলমান জনস্রোতের কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে করম আলী। ব্যক্তিজীবনের পট এ উপন্যাসে অন্বিষ্ট না হলেও ব্যক্তির দর্পণে উন্মোচন ঘটেছে সমষ্টিজীবনের। করম আলীর সংঘাতদীর্ণ জীবন উপস্থাপন সূত্রে ঔপন্যাসিক সমগ্র জীবনাবর্তকেই সঙ্কেতময় করে তুলেছেন এখানে :রাঙাবালীর করম আলীর মত আরো অনেক অনেক মানুষ এমনিতর ঝড়ো জীবনের পাখি।[২৭]

এই উপন্যাসের কাহিনিতে আছে আগুনমুখা নদীতে পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছয়জন সদস্যে একসঙ্গে সলিল সমাধি হওয়া এক উদ্ভ্রান্ত যুবক-করম আলীর উঠে দাঁড়ানোর ইতিহাস। বর্তমানে মা, ছয় ভাইবোন, বোনের চার ছেলেমেয়েসহ মোট বারোজন সদস্যের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সে। একসময় পিতা বেঁচে থাকাকালীন সময়ে গ্রামের অবস্থাপন্ন হাশেম চৌধুরীর মেয়ে সাজেদার সঙ্গে ওর বিয়ে 'একরকম ঠিকই ছিল'। কিন্তু উপকূলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জটিল ও দ্বন্দ্বময় অনিশ্চিত জীবনসংগ্রাম সব স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ওর প্রধান পেশা ডিঙি নিয়ে মাছ ধরা ও নৌকা বাওয়া। কিন্তু জীবনধারণের কোনো স্থায়ী পথ না থাকায় পরিবারের বারোটি সদস্যের অন্নের জন্য জীবিকার বিচিত্র

সড়কে বিচরণ করতে হয় তাকে। মাছ বিক্রি, মহাজনী নৌকায় বন্দরে গমন, মৌসুমে ধান কাটা, বর্গায় জমি চাষ ইত্যাদি করেও সে বাড়তি আয়ের পথ খোঁজায় ব্যস্ত থাকে। উপন্যাসের ভাষায় :

নিজের শক্তিকে সাগরের সঙ্গে তুলনা করেই আমোদ পায় বেশী। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়। নিজের চওড়া বুকের দিকে তাকিয়ে মাংসপেশী বারবার ফোলাতে থাকে। মনে হয় সাগরের মতো বিশাল বুক যার অক্ষতা তার মানায় না। রোজগার না হলে নাকের বাঁশি ফুলতে থাকে। ক্রোধ এসে সুড়সুড়ি দেয়। কখনো চুপসে যায় একদম।[২৮]

জীবনের ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য লড়াইরত এই কদম আলীরা প্রকৃতির রুদ্রতার মতো কঠিন হলেও তাদেরও রোমান্টিক-মানবিক বোধ আছে। সাজেদার সঙ্গে তার বাবার ঠিক করে রাখা বিয়ে যদিও হয়ে ওঠে না কিন্তু সাজেদাকে ভুলতে পারে না সে। আগুনমুখা নদী, বঙ্গোপসাগর তাদের সব স্বপ্ন যেমন নষ্ট করে ও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, তেমনি আবার উল্টোটিও আছে। কারণ প্রকৃতিই এখানে মূখ্য। প্রকৃতির উন্মত্ততা আর শিষ্টতার উপরএই অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে। উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে জলোচ্ছ্বাসের হিংস্র ছোবলে ধ্বংসস্তুপে পরিণত জনপদে বেঁচে যাওয়া সাজেদা যেন করম আলীর জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। অপরদিকে করম আলী চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য সমগ্র উপন্যাসে আলো ছড়ায় তা হলো—ভণ্ডমওলানা জালালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুহূর্তেই বিয়ে করে ঘরে তোলে কলিমনকে। কলিমন উপকূলীয় সংগ্রামী নারীর প্রতিকৃতি। নিখোঁজ স্বামী ও এক কন্যা সন্তানের জননী সে। তবে কলিমনের প্রতি করম আলীর দুর্বলতাও কাহিনিতে লক্ষ করা যায় :

সাজেদা ও কলিমন করম আলীর বুক জুড়ে থাকে। সাজেদার সাদা সিঁথি করম আলীকে যেমন স্বপ্নালু করে তোলে। তেমনি অমবস্যার রাতের অন্ধকারের মত গায়ের রঙের পাতলা ছিপছিপে কলিমনকে ভালো লাগে তার চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য। এই হল করম আলী। অভাবী নিঃসহায় কিন্তু সমাজের শোষক ভণ্ড কপটদের মুখে কষে লাথি লাগাতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না সে। আর তাই নিঃসঙ্কোচে জালাল মওলানার বানানো ফতোয়ার মুখে থুথু ছুঁড়ে কলিমনকে বিয়ে করে বিবেকের কাছে জয়লাভ করে। কলিমন এখন তার বড় কাছের।[২৯]

উপকূলের একরোখা বলিষ্ঠ প্রতিবাদী যুবকের সমস্ত বৈশিষ্ট্য করম আলীর মধ্যে লক্ষিত হয়। সে প্রতিবাদী, সাহসী, জঙ্গুলে স্বভাবের হলেও ভন্ড, প্রতারক নেশাগ্রস্ত নয়, এমনকি পান-বিড়িও সে স্পর্শ করে না। মা, বোন, ভাই, ভাইপো, প্রেমিকাসহ সমস্ত রাঙাবালী যার বুক জুড়ে থাকে—বঙ্গোপসাগরের মত উদার এই যুবকরাই মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য এই প্রতিকূল জনপদকে বাসযোগ্য করে রাখে। জলবায়ুর বিরূপতাকে উপেক্ষা করে এরাই জীবনের জয় ঘোষণা করে। এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করম আলীর মা।উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ভেতর মাকে দেখা যায় পুত্র করম আলীর গলা ধরে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টায় রত কিন্তু নিয়তি তাকে বাঁচতে দেয়নি। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার এ এক শোকাচ্ছন্ন, ভয়াবহ জনপদের চিত্র :

... মা'র শীর্ণ হাতের বাঁধন কঠিন হয়ে আসে। করম আলীর দম আটকে আসতে চায়। মা বাঁচতে চায়।... গলার রগ ফেটে যাবে এখন। মা'র বাহু নির্মম হয়ে উঠেছে। আর পারে না করম আলী। সজোরে মা'র পেটে একটা লাথি মারে। ছিটকে পড়ে মা।

'তুই আমারে লাথি মাইরা ফালাইয়া দিলি বাজান!' স্রোতের ওপর থেকে একটা আর্তকণ্ঠ ভেসে আসে। করম আলী কিছু জানে না।... স্রোতের একেকটা ধাক্কায় দূর থেকে দূরে চলে যায় মা।'[৩০]

জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে চরের জীবনে উপস্থাপিত হয়েছে মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র। উপন্যাসে বিধৃত অসংখ্য চরিত্রকথায় মানুষের জীবনসংঘাত ও অস্তিত্ব অভীপ্সার বিচিত্র রূপও উন্মোচিত হয়েছে। করম আলী, শাহেদ মাস্টার কিংবা মতিনের মত প্রতিবাদী ও জীবনমুখী চরিত্রের সমান্তরালে সামাজিক অপশক্তির প্রতীক আলতাফ আলী, হাশেম চৌধুরী, আফজাল মাওলানা ও গনুরানার মত চরিত্রের সক্রিয় পদচারণায় উপন্যাসের কাহিনী সংঘাতময় ও তরঙ্গমুখর।[৩১] এছাড়াও আছে শরীফা, কলিমন, জব্বার মিয়ার বিবি হালিমার মত উপকূলের সাহসী ও সংগ্রামী নারীর উপস্থিতি।

পুরুষের চেয়েও কর্মক্ষমতায় কোনো অংশে কম নয় এসব নারী। প্রকৃতির রুদ্ধতায় এ অঞ্চলের নারীরা জীবনকে তুচ্ছ করে এখানে বেঁচে থাকে।সবকয়টি নারী চরিত্রের মাধ্যমে লেখিকা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অসহায় নারীদের নীরব নির্যাতন-নিষ্পেষণের চিত্র। ধর্মকে ব্যবহার করে নিঃসহায়, দুর্বল, অশিক্ষিত, ক্ষুধার্ত মানুষকে শোষণ করার প্রক্রিয়া সুপ্রাচীনকাল হতে এদেশে বহমান। প্রকৃতির নির্মমতার সঙ্গে ধর্মকে সংযুক্ত করে অসামাজিক কর্মকান্ডকে আরো প্রবল করে তোলে সমাজের প্রভাবশালীচক্র। এরই প্রেক্ষিতে উপকূল বেষ্টিত এইসব দ্বীপাঞ্চলে হাশেম চৌধুরী, জালাল মাওলানা, পীর দানেশদের মতো ভন্ডপীররা ধর্মীয় ফতোয়া দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুখী মানুষদের শোষণ নির্যাতন চালায় :

শুক্রবার দিন গাঁয়ের জামাতে জালাল মাওলানা কলিমনের বিরদ্ধে ফতোয়া তৈরি করে। সাত দিনের মধ্যে কলিমন যদি তার মতামত ব্যক্ত না করে তবে জালাল মাওলানা তাকে বলপূর্বক বিয়ে করতে বাধ্য হবে।'... হাশেম চৌধুরী, জালাল মাওলানার পক্ষে সরবে প্রচার করায় কেউ নাক গলাতে আসেনি। [৩২]

এছাড়া আলতাফ চেয়ারম্যান, আফজাল পাটোয়ারী, গনুরানার ও জামাল শিকদারের মত সামাজিক অপশক্তি নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে সামাজিক পারিবারিক সবদিক দিয়ে:

আলতাফ চেয়ারম্যান সহজে ছাড়ার লোক না। ছাড়ার পাত্র আফজাল নয়। অন্য যে কোনো ভাবেই হোক এর শোধ তুলে নেব। আফজাল পাটোয়ারীর চিন্তার গ্রন্থিগুলো মাকড়সার মত কেবল জাল বুনতে থাকে।[৩৩]

জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসে সংঘাত-সংগ্রাম-শোষণ-নির্যাতন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পাশাপাশি আছে প্রেম-ভালোবাসা-রোম্যান্টিকতা। কিশোরী আলেয়া থেকে শুরু করে কলিমন এমনকি গনুরানারের পরকীয়া, কোথাও ভালোবাসার কমতি নেই। সমুদ্র-উপকূলীয় চরাঞ্চলের প্রকৃতির এ যেন অন্য এক বৈশিষ্ট্য। বৈরিতার ভেতর ভালোবাসার অনুভূতি শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে তোলা। ভুলিয়ে দেয় অভাব, দৈন্য ও শোষিত হওয়ার বেদনা।

এই উপন্যাসের ভাষায় রয়েছে চূড়ান্ত পরিণতির আভাস। রাঙাবালীর চর ইউনিয়নের এক আটাশ বছরের তাগড়া যুবক করম আলীর সংগ্রামরত জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনি তুলে ধরার ভিতর দিয়ে লেখিকা এক ভয়াবহতম জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। একটা জীবন্ত চরকে কয়েক মুহূর্তেই নিঃশেষ করে দেয়ার শৈল্পিক বর্ণনা এই উপন্যাস। উপকূলীয় প্রকৃতি ও চরিত্রের বর্ণনা এবং চরিত্রদের পারস্পরিক সংলাপ—প্রধানত এর বাইরে অগ্রসর হয়নি উপন্যাসের ভাষা।

জলোচ্ছ্বাস উপন্যাসে মূলত প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষই মূল বিষয় হয়ে উঠেছে।এই উপন্যাসে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদ নিরাভরণ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। এখানে সমুদ্র-উপকূলীয় নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম বিশেষ আবেদন জাগায়। এ সংগ্রাম কোনো একটি নির্দিষ্ট কালের কিংবা কোনো পরিস্থিতিতে সৃষ্ট নয়। এখানকার প্রকৃতির সাথে এর ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতা। প্রকৃতির প্রভাবই এখানে মুখ্য।

সমুদ্রের সাথে সখ্য আবার তার সাথেই যুদ্ধ—এই খেলায় মত্ত যাদের জীবন তাদের কথাই উঠে এসেছে *জলোচ্ছ্বাস* উপন্যাসে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে রাঙাবালী চরের জনজীবনের যে বিধ্বস্ত-বিলীন অবস্থা, অসংখ্য মৃত্যু, লাশ, দীর্ঘশ্বাস, স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদ ও জলোচ্ছ্বাস-পরবর্তী পরিস্থিতি, সরকারী রিলিফ পাওয়ার জন্য ছুটাছুটি— এক ধরনের জনযুদ্ধের বর্ণনা বলা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে ঝড়-ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছ্বাস ও সামাজিক অপশক্তির সাথে নিয়ত যুদ্ধরত এক জনপদের জনযুদ্ধেরই শৈল্পিক রেখাচিত্র *জলোচ্ছ্বাস* উপন্যাস।

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য থেকে উল্লেখিত মাত্র পাঁচটি উপন্যাসের আলোকে উপস্থাপিত হলো জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দুর্যোগকবলিত দেশগুলির শীর্ষে থাকা এই অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশের জনজীবনের উপর কী অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আমাদের ঔপন্যাসিকগণ অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ ভাষায় অন্তর্ঘাতময় আবেগে জলবায়ুর নৃশংস আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্তমানে

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে যেমন, বিশ্বের নানা গোষ্ঠীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব(দরিদ্র জনগোষ্ঠী,নারী, উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠী), সম্ভাব্য অভিঘাত থেকে বাঁচাবার উপায়সমূহ, ভবিষ্যতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।[৩৪] যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে কেনো প্রভাবের ক্ষতি অর্থনৈতিক-জানমালের মূল্যমানে পুরো জাতির জন্য সংকটাপন্ন তাই জলবায়ু পরিবর্তনকে যে কোনো ক্ষেত্রের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এইজন্য দরকার পরিবেশ সচেতনতা ব্যাক্তি থেকে রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে। আমাদের ঔপন্যাসিকদের নন্দনতাত্ত্বিক বর্ণনায় সরাসরি হয়তো জলবায়ু পরিবর্তনের মহামারী দিকটি নির্দেশ করে না তবে পরিস্কার ভাবে বিশ্লেষণ করলে সেই তথ্য বেরিয়ে আসে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে মানবিক ও সামাজিক বিলোপের বিষয়টি। বর্তমানে জলবায়ুর প্রভাবে বৈশ্বিক যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে অতি দ্রুত যা ভবিষ্যতে আরো বাড়ার সম্ভবনা রয়েছে, তবে মানুষ বা প্রকৃতি যে মাধ্যমেই ঘটুক না কেন,তার জন্য সকল পর্যায়ে সচেতনতা-উদ্যোগ খুবই জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. নীলোপল অদ্রি (১৪২৪), "জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতায় নগর দরিদ্রের জীবন: প্রেক্ষাপট ঢাকা", *বাংলাদেশ উন্নয়ণ সমীক্ষা*, খণ্ড ৩৫, বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা: বিআইডিএস।

২. https://bn.wikipedia.org/wiki/[অ্যাকসেস-১২ আগস্ট ২০২০]

৩. থমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৯৬৬)), *ফাস্ট এসে অন পপুলেশন*, লন্ডন, (প্রথম প্রকাশ, ১৭৯৮), পৃ. ১৩৯

৪. মহীবুল আজিজ (২০০২), *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, ফেব্রুয়ারি, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

৫. অমর্ত্য সেন (১৯৮১), *পোভার্টি এ্যান্ড ফ্যামিন্স: এন এসেই অন ইনটাইটেলমেন্ট এ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন*, ক্ল্যারেন্ডন প্রেস, অক্সফোর্ড, পৃ.১৩৯

৬. বিনায়ক সেন (১৪২৬), "সাহিত্য ও অর্থনীতি: বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষ", *বাংলাদেশ উন্নয়ণ সমীক্ষা*, খণ্ড ৩৭, বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা: বিআইডিএস, পৃ. ২৮

৭. *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী* (১৯৮৬), ১ম খণ্ড (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত), বাংলাা একাডেমি, ঢাকা, 'লালসালু' উপন্যাসের উদ্ধৃতির জন্য উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮. প্রাগুপ্ত; পৃ. ৪-৫।

৯. প্রাগুপ্ত; পৃ.৯০।

১০. শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৩৬৪), *কাশবনের কন্যা*, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬১, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা। দ্বিতীয় প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৪, উদ্ধৃতির জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

১১. শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৩৭১), *আলম নগরের উপকথা*, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬২, কোহিনূর লাইব্রেরি, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৭১, প্রকাশক: ঐ, উদ্ধৃতির জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

১২. শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*; পৃ. ৮৬

১৩. শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *আলম নগরের উপকথা*; পৃ. ১৮

১৪. প্রাগুপ্ত; পৃ. ৪০-৪১

১৫. প্রাগুপ্ত; পৃ. ৮৪

১৬. আবু ইসহাক, *সূর্য দীঘল বাড়ী*, ৪৩ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪, ১৯৬২

১৭. আবু ইসহাক, *সূর্য দীঘল বাড়ী*, পৃ. ১

১৮. প্রাগুপ্ত; পৃ. ১২৪

১৯. প্রাগুপ্ত; পৃ. ৪৪

২০. সেলিনা হোসেন (২০০৯), *জলোচ্ছ্বাস*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা
২১. সেলিনা হোসেন (২০০৯), *জলোচ্ছ্বাস*, আমার কথা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃ. ৯।
২২. রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭), *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৫৩
২৩. রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭), *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৫৯
২৪. সেলিনা হোসেন (২০০৯), *জলোচ্ছ্বাস*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা , পৃ. ১৪০
২৫. প্রাগুপ্ত; পৃ. ১৪৮
২৬. প্রাগুপ্ত; পৃ. ১৪৮
২৭. প্রাগুপ্ত; পৃ.১১
২৮. প্রাগুপ্ত; পৃ. ১১০
২৯. প্রাগুপ্ত; পৃ. ১২৫
৩০. প্রাগুপ্ত; পৃ. ১৩৫
৩১. রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭), *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৫৯
৩২. সেলিনা হোসেন (২০০৯), *জলোচ্ছ্বাস*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা , পৃ. ১১৩
৩৩. প্রাগুপ্ত; পৃ. ১১৩
৩৪. নীলোপল অদ্রি (১৪২৪), "জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতায় নগর দরিদ্রের জীবন: প্রেক্ষাপট ঢাকা", *বাংলাদেশ উন্নয়ণ সমীক্ষা*, খণ্ড৩৫, বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা: বিআইডিএস